বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

গবেষক

লিপিকা বিশ্বাস

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার AOOCL1200818 (2018-2019)

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

গবেষক

লিপিকা বিশ্বাস

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ

গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের সকল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে একসময় হিন্দুধর্ম অনুসারীদের মধ্যে দেবতা কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে ধর্মবিষয়ক আখ্যানজাতীয় এক শ্রেণির কাব্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেগুলিকে এককথায় *মঙ্গলকাব্য* নামে সাহিত্যের পাতায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জাতীয় কাব্যগুলিতে প্রাচীন ভারতের ন্যায় মধ্যযুগের সমাজে নব আবির্ভূত দেবতাদের আরাধনা ও মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে এই কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয়। এই কাব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশে ব্যক্তি ও পরিবারের অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কাব্যগুলির গুণাগুণ বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে এই কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়। এই কাব্যগুলির শুরুতে কবিরা তাদের কাব্য বন্দনা অংশে দেবতা মহিমার সঙ্গে মঙ্গলকাব্য মহিমার কথাও ঘোষণা করে থাকে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষ কোনও হিন্দু দেবতা বা দেবীকে ঘিরে আলোচনা করা হয়। এই সকল দেবতা ভাবনার মধ্যে ছিল মূলত বঙ্গদেশের লৌকিক স্তর থেকে উঠে আসা স্থানীয় কোনো দেবতা ভাবনা। এই কাব্যগুলির মধ্যে কবিরা বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি ধ্রুপদী শাস্ত্রগুলিকে সরাসরি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেনি। লোকায়ত দেব-দেবীদের ঘিরে আয়োজিত গ্রাম্য আনন্দ উৎসবে এই কাব্যগুলি পাঠ করা হত। জনপ্রিয় কাব্যগুলিকে ভজন হিসেবে গ্রামের মানুষের বিনোদনের জন্য উপস্থাপন করা হত। বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্যসমূহ সাধারণত দ্বৈত ছন্দে রচিত। রূপক হিসেবে পুরাণ ছেড়ে সাধারণ পার্থিব বস্তু যেমন - গ্রামবাংলা, মাঠ, লোকজফুল, গাছপালা ও নদী ইত্যাদির কথা ব্যবহার করা হয়েছে। কাব্য পাঠের ফলে পাঠকের মনে ধারণা জন্মে এই সকল নিম্নকোটি স্থানীয় দেবতাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। তাদের পূজাপদ্ধতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা মঙ্গলকাব্যগুলির মূল লক্ষ ছিল। এই দেবতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা অসাধারণ দৃঢ় মানবিক গুণাবলির অধিকারী। এই দেবতাদের মানবের সঙ্গে দৈনন্দিন আচার-আচরণে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের মতো এই দেবতাদের চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ মানবিক দোষ ও গুণাবলির উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যেমন - ঘৃণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা,

লোভ, স্নেহ, ভয়, প্রয়োজনে অন্যের ক্ষতি করা, অন্যায় ও চতুরতার মধ্যে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করা প্রভৃতি এই ধরনের মানবিক লক্ষণের প্রকাশ। মঙ্গলকাব্য পাঠে দেখা যায় স্থানীয় লৌকিক ও বহিরাগত পৌরাণিক দেবতাদের স্বার্থের মধ্যে প্রায়শই সংঘাত হয়েছে। পরিসমাপ্তিতে স্থানীয় লৌকিক দেবতারা জয়লাভ করেছে। কবিরা এই জয়ের বিষয়টিকে মাথায় রেখে কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্যান দিয়েছেন।

এই কাব্যগুলি লেখা হয়েছিল বিশেষ করে বৈদিক ভাবনা থেকে আগত ঈশ্বরপূজারীদের বিরোধিতা করতে। সমাজে অচ্ছুত করে রাখা লৌকিক ও মাটির সঙ্গে মিশে থাকা স্থানীয় মানুষের পূজিত দেবতাদের জয়গান সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্যের ধারার সঙ্গে 'বিজয়' শব্দটির বিশেষ যোগ রয়েছে। কাব্যগুলির মধ্যে বহু স্থানে এই বিজয় শব্দটিকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। যেমন - বিপ্রদাস পিপিলাই তার কাব্যকে *মনসাবিজয়* নামেও কাব্যে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলি নিজস্বগুণের দ্বারা হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগের চিহ্নস্বরূপ এবং সকল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারক। মঙ্গলকাব্যগুলি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত বাঙালির জাতীয় জীবনকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যের বিস্তারের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ১৭০০ সালের শেষের পর্যায়ে মঙ্গলকাব্য সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রথমে বৈদিক ধর্মের বিকাশ দেখা গেলেও সমাজের মধ্যে বেদবিরোধী কিছু প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান লক্ষ করা গেছে। যেমন - জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, অক্রিয়বাদ, নিয়তিবাদ, সাংখ্য মতবাদ, উচ্ছেদবাদ ও প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠন। এই সকল ধর্মমতগুলি সেই সমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল কিন্তু একসময়ে সমাজে এই মতবাদগুলির প্রভাব ম্লান হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছাড়াও দেশে প্রায় বাষট্টি রকমের বিভিন্ন ধর্মীয়দর্শন বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল ধর্মীয় মতবাদগুলির মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য ছিল এই যে প্রায় প্রত্যেকটি মতবাদ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী ধর্মীয়মত ও দার্শনিক পথ। এই মতবাদগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ধর্মীয় মতবাদ হল জৈনধর্ম। এই ধর্মমত সেই সময়কালে সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমাজে এই ধর্মানুসারী শিষ্যের সংখ্যাধিক্যতা লক্ষ করা গেছে। প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে এমনটা প্রমাণ পাওয়া যায়

যে - খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের পূজা করা হত। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত যজুর্বেদ গ্রন্থে তিনজন জৈন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়, যথা - ঋষভনাথ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ভাগবত পুরাণে ঋষভনাথকে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জৈন সমাজে প্রচলিত লোককথা থেকে জানা যায় ঋষভনাথ বর্তমান চক্রার্ধে (জৈন চক্রানুসারে) এই ধর্মীয়মতটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখগুলি থেকে যে দেশকালের বর্ণনা, সমাজের ছবি ও সময়কালের নমুনা পাওয়া যায় সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশি রাখে। অভিলেখগুলিতে দেখা গেছে জৈনদের পরিচিতি বিষয়ক নানা পারিভাষিক শব্দ এবং জৈন তীর্থঙ্করদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ সাম্রাজ্যের সময়ে (খ্রিস্টপরবর্তী প্রথম শতক) কিছু জৈন মূর্তিলেখ পাওয়া যায়। যেখানে প্রতিমা সর্বতোভদ্রিকা (জিন চৌমুখীমূর্তি), আয়াগ পট ও দেবনির্মিত স্তূপ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব বিস্তার করে আসা বেদবিরোধী অন্য একটি প্রতিবাদী ধর্মীয়ভাবনা হল বৌদ্ধধর্ম। যা বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধর্মীয়ভাবনার মধ্যে আড়ালে-আবডালে যথেষ্ট মহিমার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে। বাঙালির সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বৌদ্ধভাবনার উপস্থিতি বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে শাক্য বংশজাত সিদ্ধার্থ গৌতম যার হাত ধরে বৌদ্ধধর্ম উৎপত্তি লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে এশিয়াসহ বিদেশেও এই ধর্ম বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তিনটি শাখা হল - থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান। বৌদ্ধ দর্শনে বেদ গ্রন্থকে সর্বজ্ঞ বলে মনে করা হয়নি। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের মতকে খণ্ডন করে বলেছেন – বাক্য সমষ্টি রূপ বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মূলে বলা হয়েছে চারটি আর্যসত্যের কথা। যেখানে বুদ্ধের চার আর্যসত্য অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের লক্ষ হল তৃষ্ণা বা আসক্তি এবং অবিদ্যা থেকে দূরে থাকা। এই সকল বাহ্যিক কর্মগুলি থেকে উদ্ভূত দুঃখকে নিরসন করা এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ দর্শন ও ঐতিহ্যগুলিতে নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নির্বাণের মাধ্যমে মোক্ষলাভের কথা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধযুগকে বাংলাদেশের সামগ্রিকভাবে সর্বাধিক উত্থানের কাল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে বাংলাদেশের সুখ্যাতি বা পরিচিতি দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল নানাবিধ দেশজ সম্পদ

এবং ঐতিহ্যের কারণে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গদেশের নাম সুখ্যাতির মধ্যে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্য এবং জৈনধর্মের সামান্য উপস্থিতি থাকলেও একসময়ে সমাজে এই দুই ধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মতো বিরোধী ধর্মমতগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ছদ্মবেশে ছোটো ছোটো বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম ও লোকায়ত ধর্মমতগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। এই ধর্মমতগুলিকে আশ্রয় করে সমাজে যেসকল নতুন দেবদেবীদের উদ্ভব হয়েছিল তাদের গুণগান করে সাহিত্য জগতে মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলাদেশের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম গরিষ্ঠাকারে অবস্থান করলেও তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে এই ধর্মগুলির তেমন ভাবে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে প্রথমে আসে বেদের কথা, এরপরে বেদ বিরোধী ধর্মমত। পুনরায় বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও দেবতাদের পূজাপদ্ধতি ফিরে আসতে শুরু করে লোকায়ত স্তরের সমাজ ভাবনা ও পূজা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। তখন সমাজে মানুষ মিশ্র লোকায়ত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। লোকায়ত ধর্মকথাকে ঘিরে মধ্যযুগের সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। বৈদিক ধর্মের কথা ও আচারপদ্ধতি সেই সঙ্গে বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কথা এবং আচরণগুলি প্রকাশমান হতে শুরু করে। মঙ্গলকাব্যের মিশ্র দেবতাভাবনা, সংস্কৃতি, ধর্মকথা ও আচরণগুলির মধ্যে।

প্রথম অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, সাহিত্য ও দেবভাবনার পরিচয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকৃতির আদিম জাতির বাসভূমি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করে অস্তিত্বের লড়াইয়ে একে-অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করে বেঁচে রয়েছে। বর্হিশক্তির আক্রমণের ফলে আর্য-অনার্যের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে তৈরি হয়ছিল সংক্রান্তিকাল। এই সময়ে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের লোকেদের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়। একইভাবে লোকায়ত অন্ত্যজ দেবতারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আর্য-ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গৌতমবুদ্ধ দ্বারা প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎসারিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রচলিত লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। একইভাবে

জৈনধর্মের দেবতাগণ তাদের ভাবনা, বিশ্বাস, আচার, রীতি নিয়ে প্রচলিত সমাজের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে এই দেবতারা ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে স্থান করে নেয়। তৈরি হয় একটি মিশ্রসত্ত্ব সমাজ। এই সমাজ থেকে উদ্ভূত দেবতারা নাম পায় 'মিশ্রসত্ত্ব দেবতা'। মঙ্গলকাব্যের এইসকল মিশ্রসত্ত্ব দেবতারা হলেন – মনসা, চণ্ডী, শিব ও ধর্মঠাকুর প্রধান মঙ্গলকাব্যের দেবতা। শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, রায়, সূর্য, অন্নদা, সারদা, তীর্থ, জগন্নাথ ও প্রভৃতি অপ্রধান মিশ্রসত্ত্ব মঙ্গলকাব্যের দেবতা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে দেবতা কেন্দ্রিকতা। ব্যতিক্রমী সাহিত্যের সংখ্যা সামান্যমাত্র। মধ্যযুগ–এর সাহিত্য দেবতাবর্ণিত সাহিত্য আখ্যা পেলেও, এখানে মানুষের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা অনুভূতিগুলির বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি। দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা কাব্যে ধরা পড়েছে একটা উপরি আবরণ হিসেবে। আবরণটি খসিয়ে দিলে সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনরসের উষ্ণ প্রস্রবনের স্রোত পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক পূর্ব সমগ্র সাহিত্যের ধারাতে মানবজীবন রসের কথা উল্লেখ থাকলেও, মঙ্গলকাব্যের ধারাতে এই বর্ণনা সর্বাগ্রগণ্যতা লাভ করেছে। এক বিশেষ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের ফলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য রাজনীতিতে যে বিরাট গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল যার হাত ধরে তৈরি হয়েছে মঙ্গলকাব্যের ধারা। সাহিত্য সৃষ্টি হয় জাতির মানসলোকের ইতিহাসকে ঘিরে। জাতির মানসলোক লুকিয়ে থাকে তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) হাত ধরে তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মুসলিমদের শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশ শাসিত হয়েছিল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজাদের হাতে। বৌদ্ধ ও জৈন ভাবাপন্ন রাজাদের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজারা হিন্দুধর্মের শাস্ত্রাচারমূলক বিধি-বিধান, বর্ণাশ্রম, কৌলীন্যপ্রথা।

বুদ্ধ সমকালে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরতত্ত্বের যে ধারণা পাওয়া যায়, সেগুলি আজকের বৌদ্ধধর্মের থেকে কিছুটা সরে এসেছে। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রকাশ্যসভায় মানবকে উপদেশ দিয়েছিলেন – দুঃখতত্ত্ব বা চার আর্যসত্যের মধ্যে দিয়ে। যেখানে তিনি মানবের দুঃখের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন - অর্থাৎ দুঃখ কি? দুঃখ কেন আসে প্রভৃতি। বুদ্ধ নিজে প্রথমে কঠোর তপস্যা করে সফল হয়েছিলেন। নিজে প্রথমে দুঃখমুক্তির বাণী উপলব্ধি করেন। পরে সেগুলি মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই মহামানব অবিদ্যাজনিত জড়া-মরণ থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন।

মানুষের জীবনে দুঃখ অনিবার্য কিন্তু এই দুঃখের বিনাশও সম্ভব। চার আর্য্যসত্য ছাড়া প্রতীত্যসমুৎবাদ এবং পঞ্চস্কন্ধ মূলত এই তিনটি মৌলিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে মানবদুঃখের কারণ খুঁজতে চেয়েছিলেন। সকল মুক্তির কথা লিখিত হয়েছে তাঁর 'অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ' নামক সূত্রাবলীতে। এই অংশে তিনি ঈশ্বর নিয়ে বিস্তৃতভাবে কোন বর্ণনা করেননি। তিনি পার্থিব জগৎ থেকে মুক্তিলাভের দিককে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মচক্র, পরিনির্বাণ বিষয়ক সহস্র উপদেশ এখানে রয়েছে। সঙ্ঘের নিয়মাবলী এখানে নির্ধারন করা হয়েছে।

জৈনধর্ম হল প্রাচীন শ্রমণপ্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত। ভারতবর্ষের মাটিতে এই ধর্মের উৎপত্তি হয়ে, এই ধর্মমতটি ভারতের মাটিতে অস্তিত্ব হারাতে থাকে একসময়। কোন মানুষ যখন আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বিরাগ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে ধ্যান ও তপস্যা দ্বারা জয় করে। সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান (কেবল্ জ্ঞান) লাভ করে তখন তাকে জিন বলা হয়। জিনরা মানবজাতির পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তির পথ-প্রদর্শক হয়ে মানুষের কাছে আত্মিক মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেয় তীর্থঙ্করদের মাধ্যমে। এই মুক্তি কোন স্বর্গ বা ঈশ্বরতত্ত্বের কথা বলে না। তারা আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলে। জিনদের আচরিত ও প্রচারিত এই পথের অনুগামীদের বলা হয় জৈন। এই সকল জৈনদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মমতকে বলা হয় জৈনধর্ম। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষলাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভের পন্থা। এই ধর্মমতটি হল বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ধর্মমত। জৈন চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের শিক্ষা জৈনধর্মের মূল ভিত্তিস্বরূপ। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভনাথ এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম মহাবীর।

বৌদ্ধ সাহিত্যের যে নমুনাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত মানস* একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। নৃপতি দেবপালের সভাকবি অভিনন্দের কাব্যের দেবী–মাহাত্ম্য বর্ণনায় বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি জয়দেবের উদারতার কথা উল্লেখযোগ্য। *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* গ্রন্থটির সংকলকের নাম জানা যায়নি তবে গ্রন্থের শুরুতে বুদ্ধপ্রশস্তি দেখে অনুমান করা হয় যে গ্রন্থ সংকলক বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিলেন। মহাযান শাখাটি লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে মিশে তান্ত্রিক উপযানগুলি তৈরি হয়। এই তান্ত্রিক উপযানের পালনকারীরা নিজেদের পরিচয়কে লুকিয়ে রেখে প্রাচীন বাংলা ভাষায় নিজ মতের

তত্ত্বকথা রচনা করে। পরবর্তী হীনযানদের ওপরে এই গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছিল। *দোহাকোষ* ও *চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়* গ্রন্থে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহজযানীরা পূজা–অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রজপে তেমন বিশ্বাস করে না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল নিজের শরীরের মধ্যে বুদ্ধের অবস্থান রয়েছে।

জৈন ধর্মশাস্ত্রগুলি পুনরায় লিপিবদ্ধ হয়। শাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান গ্রন্থটি হল *কল্পসূত্র*। জৈনধর্মাবলম্বীরা মনে করে কল্পসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে গোদাস ছিলেন অন্যতম একজন। এই গ্রন্থ থেকে জৈনধর্মের বেশ কিছু শাখার নাম জানতে পারা যায়। শাখাগুলির প্রবক্তা ছিলেন গোদাস, তার প্রবর্তিত মূল শাখার নাম হয় গোদাসগণ। এই গোদাসগণ শাখা আবার কয়েকটি উপশাখায় ভাগ হয়েছে – তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও কর্ব্বটিকা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে বঙ্গের এই অঞ্চলগুলিতে জৈনধর্মের প্রভাবের কথা অনুমান করা যায়। সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় – পূর্বভারতের কিছু অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রাবল্যতা দেখা গেছে। মহাভারতে এই কর্ব্বট জনবসতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনদের নৃতাত্ত্বিক নমুনা হিসেবে তুলে আনা যেতে পারে শরাক জাতির কথা। অনুমান করা যায় এই জাতির নাম এসেছে মূলত জৈন শ্রাবক সম্প্রদায়ের প্রভাবে। এই জাতিদের মধ্যে এখন হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *আচারাঙ্গসূত্র* জৈনদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের কথা জানা যায়। মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করার পূর্বে কিছুদিন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা মনসা যার সঙ্গে বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী ও জৈনদেবী পদ্মাবতীর সাদৃশ্য রয়েছে। এই তিনজন দেবী তিনধর্মের মানুষের সর্পভয় দূর করে। জৈনদেবী পদ্মাবতী, বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী ও মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবী আদতে অভিন্না। এই হিন্দু পৌরাণিক দেবতাদের গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির মিল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য – অনুমেয় সরস্বতী মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা ও দেবগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অবশ্যই অনেক পরের ঘটনা। বৈদিকযুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিকযুগে উপনীত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর মধ্যে দিয়ে। পৌরাণিক দেবী সরস্বতীর সঙ্গে জৈনদেবী সরস্বতী ও বৌদ্ধদেবী সরস্বতীর সাদৃশ্য রয়েছে। জৈনদের মধ্যে ষোলোটি বিদ্যারদেবী রয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রুতিদেবীকে প্রকৃতজ্ঞানের দেবী মনে করা

হয়। বৌদ্ধদের সাধনমালায় বজ্রসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্যসরস্বতী এই চারজন দেবীর নাম পাওয়া যায়। এইসকল দেবীদের রূপ পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। হিন্দুদের সর্বমঙ্গলের দেবতা সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি বিশ্লেষণে একই কথা মনে হয়। বিঘ্নান্তক অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা প্রধানত দ্বারপাল রূপে উল্লিখিত হয়েছে সাধনমালা গ্রন্থে। বিঘ্ন অর্থে বাধা, কিন্তু বজ্রযানে বিঘ্ন বলতে হিন্দু দেবতা গণেশকে বোঝায়। যেহেতু গণেশ সিদ্ধিদাতারূপে পূজিত হয় তাই বৌদ্ধরা গণেশকে বিঘ্নরূপী মনে করে এবং বিঘ্নান্তক নাম দিয়েছে। ব্রাহ্মণ্যদেবতা গণেশের পূজার প্রচলন জৈনধর্মেও বহাল হতে দেখা গেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের মত জৈনদের মধ্যে দেবতা শিবের প্রচলন ছিল। হরপ্পাসভ্যতা থেকে ঋষভনাথের সময়কাল অনুমান করা হয়। সেই সময়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে তাঁদের মাতৃদেবীর আরাধনা ও শিবপূজার প্রচলনের কথা জানা যায়। বৌদ্ধধর্মে নীলকণ্ঠ নামে একজন দেবতার পূজার কথা জানা যায়। জৈন তীর্থঙ্কর অভিনন্দের সঙ্গে শক্তিদেবী কালিকার নাম সম্পর্কযুক্ত। এই দেবীর চারটি হাত, পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত, প্রথম দুই হাতে থাকে বরদ মুদ্রা। দ্বিতীয় দক্ষিণ হাতে সাপ ও বাম হাতে থাকে অঙ্কুশ। তেমনি বৌদ্ধধর্মের দেবী কুরুকুল্লা ও হিন্দুদের শক্তিদেবী কালিকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন অর্থাৎ এই তিনের দৈবীকল্পনার মধ্যে কোথাও না কোথাও যোগসূত্র রয়ে গেছে।

গুপ্তযুগে (আনুমানিক ৩২০-৫৫০ খ্রিস্টাব্দে) পূর্বে ওড়িশা থেকে পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত শ্বেতাম্বর জৈনরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। দিগম্বর জৈনরা দাক্ষিণাত্য, মহীশূর ও দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গৌতম বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মমত দীর্ঘকাল ধরে ভারতভূমিতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। কালের নিয়মে এই মতাদর্শের অবসান ঘটেছে কিন্তু নবাগত ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বীজ বপন করে রেখে গেছে। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজকে হিন্দুসমাজ বলা যেতে। এই সময়ে সমাজে উঁচুনীচুর ভেদাভেদ মুছে সকলে সমান হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এই সময়েই মহাযান-উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে রূপবদল করে নিজেদের রক্ষা করেছিল। এই সময়ে যেসকল সাহিত্য তৈরি হয়েছিল সেখানেও সাহিত্যের গঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলা সাহিত্যেতিহাস চর্চার নিরিখে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব: 'বৌদ্ধ ও জৈনযুগ' সহ 'হিন্দু-বৌদ্ধযুগ' এর পুনর্বিবেচনা

প্রাচীন যুগের বেদবিরোধী জৈনধর্মের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। প্রাচীন যুগের শেষের দিকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এই সকল ধর্মগুলির উত্থান-পতনের ফলে দেশের ধর্মীয় পরিকাঠামো এবং সাহিত্যে ধারারও বদল ঘটেছিল। অনুমান করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বে বাঙালিরা একটি বিশেষ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। জন্ম দিয়েছিল বাংলা ভাষার। প্রথম দিকে বাংলায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এবং অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত কবিতা সংকলনে বাঙালির সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদগুলিকে ধরা হয়। বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্র এই পদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কাঁটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আগমন ঘটেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের (চতুর্থ-ষষ্ঠ শতাব্দী) সংস্পর্শে এসে। কিছু অঞ্চলে জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যতার কথা জানা যায়। সেই সময়ে রাজাদের তোষণের আশায় বিভিন্ন সাহিত্য তৈরি হতে থাকে। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে উঠে আসে সেই সময়ের কৃষিবিদ্যার দৃষ্টান্ত, জোতিষতত্ত্ব, সমাজের রীতি-নীতি, আইন-কানুনের নমুনা। দার্শনিক ধারণা আর তান্ত্রিকতাযুক্ত জ্ঞান-গর্ভমূলক কিছু বর্ণনা। প্রাচীন যুগের ছড়া বা গীতিগুলিতে দেবতার প্রাধান্য তেমনটা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের সাহিত্য আনে বিরাট পরিবর্তন, এখানে ধরা পড়ে দেবতা আরাধনা প্রাধান্যতা। কোন এক বিশেষ দেবতাকে উদ্দেশ করে গীতাকারে সুন্দর কাহিনির বিস্তার ঘটে। মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য থেকে সেই সময়ের সাহিত্যগুলিকে মোট চারটি উপধারায় বিভাজিত করা হয়েছিল। যথা – লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও জনসাহিত্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ ও জৈন যুগের সমাবেশের দৃষ্টান্ত উঠে আসে। এই ধারণা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং সেগুলি কীভাবে সংঘটিত হয়েছে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

মধ্যযুগে মাটির কাছকাছি বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে শক্তি পূজার উদ্ভব হয়েছিল। যেখানে ভক্ত ইষ্ট দেবতাকে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী করে নিজের মধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন বলে মনে করে। এই শক্তিলাভের মধ্যে নানাবিধ রসের সঞ্চার হয়, যেমন - ভক্ত নিজের দুর্গতিতে শক্তি পূজা করে সাহস অনুভব করে দেবীর প্রতি ভীত হয়। ভক্তের উন্নতিতে শক্তি অনুভব করে কৃতজ্ঞ হয়। দেবতার কোপ যেমন তাঁদের কাছে ভয়াবহ অন্যদিকে দেবতার সুপ্রসন্নতাও তেমনি অতিশয় আনন্দ সঞ্চার করে। দানবীয় শক্তির সম্মুখে অসহায় মানুষ মাতৃশক্তির আরাধনায় একসময় ব্যাপৃত হয়। প্রথমদিকে সমাজে এই নারী শক্তিকে অমঙ্গলকারিণী ও বিপজ্জনক দেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহ মিহিরের *বৃহৎ-সংহিতায়* এই মাতৃকাশক্তি দেবীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার এক বিশেষ জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন প্রকারের শুভ-অশুভ শক্তিকে ব্যক্তি তাদের মতো মানবচরিত্রের দোষ-গুণের সঙ্গে গড়ে তোলে।

মধ্যযুগে দীর্ঘ চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। সমাজের অন্তঃস্থলে থাকা নারীরা বিবিধ ব্রত ও পার্বণগুলি পূর্ব থেকে পালন করে এসছে। পুরুষেরা কিছু লৌকিক দেবতার উপর নির্ভর করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। পুরুষদের কল্পনায় এবং সাহিত্যের ধারায় মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্যে দেখা যায় নায়ক ও নায়িকার ধর্ম আদর্শের বিরোধ। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। এই দেবীরা বঙ্গদেশের সমাজের উপরি স্তরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় মতাদর্শ এবং মন্দিরের মধ্যে স্থান দখল করে।

সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল জুড়ে ভারতবর্ষে জৈনধর্মের প্রভাব রয়েছে। জৈনদের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীরের দেহাবসানের পরেও জৈনধর্মের বিনাশ হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালের এই ধারার কিছু শ্রমণ জৈনধর্মের পথকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জৈনধর্মের প্রায় সমকালের অন্য একটি ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। দুই ধর্মের মধ্যে কিছু ভিন্ন ধ্যানধারণা থাকলেও বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম থেকে কিছু আদর্শ গ্রহণ করে আপন ধারাকে পুষ্ট করেছে। বৌদ্ধধর্মে স্তূপ পূজার কথা বলা হয়েছে। জৈনদের মধ্যেও রয়েছে এই সমাধি পূজা বা স্তূপ নির্মাণের নমুনা। জৈনদের সঙ্গে বৌদ্ধদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা এইভাবে ইতিহাসে বারবার উঠে এসেছে। জৈন শাস্ত্রগুলি থেকে জানা যায় মহাবীরের

মতাবলম্বীরা আধাত্ম্যচর্চার জন্য চৈত্যে অবস্থান করতেন। অপরদিকে গৌতমবুদ্ধ এই চৈত্যগুলির সম্মান প্রদান করতেন। তার গৃহী ভক্তদের এই চৈত্যের প্রতি আগ্রহ দেখাতে উৎসাহ প্রদান করতেন।

সমাজে বৌদ্ধধর্ম তার স্থান হারাতে শুরু করে। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হতে শুরু করে। বঙ্গদেশে রাজপাট বদলের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম রাজরোষের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতে গৌড়পাদ উপনিষদ ব্যাখ্যায় বৌদ্ধদর্শনকে গ্রহণ করলে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। সাংখ্যদর্শনের মধ্যে উপনিষদের প্রভাব যথেষ্ট নিগূঢ়ভাবে রয়েছে। অদ্বৈত ও কাশ্মীরি শৈবধর্ম কালক্রমে, অদ্বৈত মতাবলম্বীরা শঙ্করকে শিবের অবতার বলে মানতে শুরু করে। বৈষ্ণব ভাবধারায় মধ্ব দ্বৈতবেদান্তের প্রবর্তন করেন। এই দর্শনের মধ্যে অদ্বৈতবিরোধী একটি উপনিষদ-ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে বেদান্তকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম ধরে নেওয়া হয়। এই নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের হাতে অদ্বৈতবেদান্ত ব্যাখ্যাটি নব্য-বেদান্ত নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ মুক্তি অর্জনের জন্য সমাধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করে বিস্তারলাভ করতে থাকে ভারত বর্ষের মাটিতে। ভারতবর্ষে প্রথমদিকে ধর্ম নিয়ে তেমন কোন বিবাদ ছিল না। একই পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের সদস্যের বসবাস ছিল। তুর্কী আক্রমণের সময়ে সমাজে মোট চারটি প্রধান ধর্মীয় মতাদর্শের প্রকটভাবে প্রচলন দেখা গিয়েছিল। যেমন - দেশীয় প্রাচীন লৌকিক দেবতার পূজা, মহাযান বৌদ্ধমতের একটি স্থানীয় রূপ, যোগী মত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত, যেখানে মূলত বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী-উপাসনা এই চার পদ্ধতিতে পূজা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে এই প্রধান চারটি ধারা মিলে মিশে জন্ম দেয় পৌরাণিক ও অপৌরাণিক নামক দুটি বৃহৎ ভিন্ন ধারার। কালান্তরে হিন্দুধর্মের রদ বদল ঘটে। হিন্দুধর্মের মধ্যে ধীরে ধীরে কীভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল সেগুলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এবং এই ধর্ম প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে মগধ, বৈশালী, কাশী, বেনারস প্রভৃতি রাজ্যেগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় অন্যান্য ধর্মগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে কখনও নিজেকে বর্ধিত করেছে। কখনও মিশে গেছে অন্য ধর্মীয় স্রোতের মধ্যে। এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ নামে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন ঘটেছে বিভিন্ন সময় ধরে। বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত থেকে শুরু করে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একদা বৌদ্ধধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ভারতবর্ষে। সম্রাট আশোকের রাজত্বের দু-এক শতক পর থেকে বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্বরূপ হারাতে থাকে। এই পরিবর্তন এতটা প্রকট হয়ে যায় যে, প্রথমিক স্তরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই রূপবদলকারী বৌদ্ধধর্মের তেমন কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করে। যা দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রচলিত ইতিহাস রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বাংলার সংস্কৃতিকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সংস্কৃতি' বলে সওয়াল করেছিলেন। যা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। প্রাচীন ভারতের পালি ভাষায় লিখিত সাহিত্যগুলিতে ষোড়োশ মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গের নাম উল্লিখিত না হলেও অঙ্গুত্তনিকায়–এর মহাবগগ অংশে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিতে রাঢ়বাসী একজন যুবকের কথা জানা যায়, যে শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গিয়েছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ *মিলিন্দ প্রশ্ন* ও *দিব্যাবদান* এই দুটি গ্রন্থে ও পুণ্ড্ররাজ্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জৈনদের সময়ে বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা জানা যায় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ়অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। *আয়ারাঙ্গ সুত্ত* গ্রন্থটি থেকে জানা যায় রাঢ়ভূমির লোকেরা তার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রতি নানাবিধ অশিষ্ট ব্যবহার করেছিল। রাঢ়ভূমির মানুষের আচার-ব্যবহার, ভূমির অবস্থান ও পথঘাঁটের বিষয়ে এই গ্রন্থটি থেকে জানা যায়। এই অঞ্চলের দুর্গম জঙ্গল ও মানুষের অশন-বসন যেগুলির একটিও মহাবীর জৈনের রুচিকর বোধ হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করে নিতে সাহায্য করে এই বৌদ্ধ ও জৈনযুগের সমকালীন লেখকগোষ্ঠীর রচনা। রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় - তিনি বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত রাজা অংগের সঙ্গে যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ সদব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। ধর্মীয় কারণে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বকে তুলে ধরার জন্য লিখিত না হলেও, গ্রন্থ মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য খুঁজে বার করা যায়। সেই সময়ে অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিকাঠামোর যোগসূত্র ও ধর্মব্যবস্থার বিষয়ে জানা জায়। জৈন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সুদের ব্যবসাকে তেমন খারাপ নজরে দেখা হত না। তখনকার সমাজের ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ

প্রশংসামূলক প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে গৌতমবুদ্ধ আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ছিলেন মানুষকে। যার উল্লেখ রয়েছে প্রাকপর্বের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব পরবর্তী হিন্দুধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় উভয় ধর্মের দৈবীভাবনা এবং মঙ্গলকাব্যের দৈবীভাবনার মধ্যে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে প্রথমে বঙ্গদেশের ধর্মের ইতিহাস খুঁজে বার করতে হবে। এমনকি ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ইতিহাস উঠে আসে।

প্রাচীনযুগের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মের বর্ণনা তেমন পাওয়া যায় না। বর্তমান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। হিন্দুধর্মের প্রভাব সমাজে থাকলেও সেখানে পরিবর্তন এসেছে। মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে লোকায়ত ধর্মের দিকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে রাজত্ব করে যাওয়া এই তিন ধর্মমতকে একত্রে পাশাপাশি দাঁড় করালে দেখা যায় দুটি যুগের ছায়া, যথা - বৌদ্ধ ও জৈনযুগ এবং হিন্দু-বৌদ্ধযুগ। এই দুটি যুগের বিভাজনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিছুটা স্পষ্ট রূপ পেয়ে যায়। যা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বের।

তৃতীয় অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যের দেবভাবনা ও দর্শনে, বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা ও দর্শনের পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদানের প্রতিগ্রহণ

বৌদ্ধধর্ম বহুকাল স্বমহিমায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন প্রবাহ ধারায় বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারলাভ করেছিল। বাংলার আদিম জনসাধারণ অনার্যবিদ্বেষী আর্যগণের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসারকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের আত্মিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। বাংলার ইতিহাসে পালযুগ রাজশক্তির পরিপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ের সুবর্ণ যুগ। সেন-বর্মণ যুগের পটভূমিকা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার যুগ। সেন রাজসভায় লোকজীবনের ধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলায় ফেলে রাখে। তারা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের অন্তরালে গোপন সাধন পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেয়। বঙ্গদেশে এই সময়ে তুর্কী আক্রমণ হয়। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রসঙ্কটের ঝড়ঝঞ্জায় বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পথ এই সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য

বন্ধ হয়ে যায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে, বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও লৌকিক ধর্মের যৌথ মূর্তিধারী দেবদেবীগণ আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। লোকজীবনের এই পরিণতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় নিজের আত্মসম্প্রসারণের পথ খুঁজে পায়। বৌদ্ধ প্রভাবিত লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের চিহ্নরূপে মঙ্গলকাব্যগুলি প্রমাণ বহন করে চলেছে। ফলে প্রধান ও অপ্রধান সকল মঙ্গলকাব্যের দেবতা বর্ণনা ও গতিবিধির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পৌরাণিক ও লোকায়ত উভয় উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে, বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন যুগের যাত্রা পথকে সুদৃঢ় করেছিল। জৈনধর্মের পরে অবসিতপ্রায় বেদ বিরোধী বৌদ্ধযুগ ও নবাগত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার কাল শুরু হয়। এই যুগগুলির সমগ্র বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে গ্রথিত রয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে তাই 'যুগ-সন্ধিক্ষণের' কাব্য বলা হয়ে থাকে।

ভারতীয় প্রাগ-বৈদিক সমাজের দেবতা হিসেবে অনুমান করা হয় দেবতা শিবকে। যেখান থেকে অনুমান করা হয় বর্তমান দেবতা শিব প্রাগ-আর্যসভ্যতা থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে সমকালীন ধর্মীয় ব্যাখ্যা যতটুকু পাওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানে দেখা গেছে, মাতৃকারূপের পূজা সেখানে বেশি প্রচলিত ছিল। সেখানে শিবের অনুরূপ একজন দেবতার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রাপ্ত দেবতার সঙ্গে অনেকগুলি শিবলিঙ্গের মতো মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিবমূর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল তার তৃতীয় নয়ন, গলায় বাসুকী নাগ, জটায় অর্ধচন্দ্র, জটার উপর থেকে প্রবাহিত গঙ্গা, অস্ত্র ত্রিশূল ও বাদ্য ডমরু। শিবকে সাধারণত শিবলিঙ্গ নামক বিমূর্ত প্রতীকে পূজা করা হয়। হিন্দু দেবতা শিবের এই সকল বৈশিষ্ট্য দেখে মহেঞ্জদারোর প্রাপ্ত মূর্তিটিকে আদি-শিব এর নিদর্শন বলে দাবি করা হয়ে থাকে। এই মূর্তিটি হিন্দু দেবতা শিবের কিনা এই নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। কেননা জৈনপন্থীদের যে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ বা আদিনাথ। সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত এই মূর্তিটিতে দেখা যায় পুরুষ মূর্তিটি হাটুমুড়ে যোগভঙ্গিমায় বসে রয়েছে। তার পাশে একটি ষাঁড় আবস্থান করে রয়েছে। প্রাচীন যুগের ধংসাবশেষ

থেকে প্রাপ্ত ঋষভনাথের ফলোকে সর্বদা একটি ষাঁড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিবের সঙ্গে ঋষভনাথের এই সাদৃশ্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের মধ্যে জৈন ভাবনার উপস্থিতির কথা মনে করায়। প্রাচীনযুগে গাছগাছালি ও পশু, যেমন - কুমির, সাপ, ষাঁড় এই সকল জন্তুদের মূর্তি পাওয়া যায়। তখনকার মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন এবং বন্যপশুর চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরির নমুনা পাওয়া যায়। নন্দী নামের একটি পৌরাণিক ষাঁড়ের কথা জানা যায়, যে ছিল শিবের বাহন। শিবকে পশুদের রক্ষাকারী দেবতা মনে করা হয়, তাই শিবের অপর একটি নাম হল পশুপতি, যার অর্থ গবাদি পশুর দেবতা। 'শিবায়ন' কাব্যে সতী দক্ষযজ্ঞে যাওয়ার জন্য শিবকে তুষ্ট করতে 'পশুপতি' নামে সম্বোধন করেছে। পশুদের দেবতা বলে শিবের এইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। অথর্ববেদ ও শতপথব্রাহ্মণ্য-তে পশুপতি নামে শিবকে সম্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা শিবের সঙ্গে বৌদ্ধ দৈবীভাবনার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধদের অমিতাভকুলের একজন 'সপ্তশতিক হয়গ্রীব' নামে একজন দেবতার নাম পাওয়া যায়। যার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায় - অমিতাভকুলের এই দেবতা মহাবলের মতো দেখতে ভীষণাকৃতি। দংষ্ট্রাকরাল বদন, সর্পের আভরণ, অগ্নিজ্বালাসদৃশ কেশরাজি, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, খর্ব ও লম্বোদর আকৃতির এই রূপ সুরাসুরদের ভয় তৈরিতে সাহায্য করে। হিন্দুদেবতা শিবের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যাঘ্রচর্ম বা বাঘছাল ব্যবহৃত হয়। শিবের অপর একটি নাম হল কৃত্তিবাস। শিব ব্যাঘ্রচর্মের আসনের উপর উপবিষ্ট থাকে। ব্যাঘ্রচর্মের আসন ছিল প্রাচীন ভারতের ঋষিদের জন্য রক্ষিত একটি বিশেষ সম্মান। 'বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর' সম্প্রদায়ের দেবতা 'নীলকণ্ঠ'। যার গঠন সম্পর্কে জানা যায় – দ্বিভুজ যার একটি হাতের ওপর অন্য হাত সমাধিমুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। হাতের উপর নানা রত্ন পরিপূর্ণ একটি কপোল থাকে, শরীর নিরলংকার এবং ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বিরাজ করে। দুটি ফণাধর সাপ পরস্পর পুচ্ছ জরিয়ে দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবতার কণ্ঠে নীলবর্ণ বিষগুটিকা থাকে। এই বিষগুটিকার জন্য এই দেবতার নাম রাখা হয়েছে নীলকণ্ঠ। হিন্দুদের দেবতা শিবের এইরূপ নীলকণ্ঠ নামের কথা জানা যায়। বৌদ্ধদেবতা নীলকণ্ঠ ও হিন্দু দেবতা শিবরূপী নীলকণ্ঠের মধ্যে সাদৃশ্য বজায় রয়েছে। একইভাবে মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও মঙ্গলকাব্যের প্রধান এবং অপ্রধান সকল দেবতাদের মধ্যেই এইরূপ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দেবতাদের পৌরাণিক উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মীয় সমাজের লোকায়ত ধর্মভাবনাগুলি এসে মিলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের রচনাকাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী এই সময়ের মধ্যে হলেও, এই কাব্যগুলির আখ্যানের মূলরূপ আরও প্রাচীন। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রচলিত লৌকিক উৎসকে নিজেদের কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেছে। এই লৌকিক উপাদানগুলি দীর্ঘদিন ছিল মৌখিক। মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজনে মৌখিক উপাদানগুলি লিখিত রূপ পেয়েছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের উপাদান মূলত রাঢ় বাংলার লৌকিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ধর্মঠাকুর বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জনসাধারণ কর্তৃক পূজিত একজন হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মীয়ভাবনা দ্বারা গঠিত একজন মিশ্র দেবতা। ধর্মমঙ্গলকাব্যের দেবতা ধর্মরাজ 'ধর্মশিলা' দ্বারা পূজিত হয়ে থাকে। এই ধর্মশিলার সঙ্গে বৌদ্ধশিলার যোগ খোঁজা হয়েছে। এই ধর্মদেবতার সঙ্গে হিন্দু প্রভাবিত অঞ্চলে বিষ্ণুর কূর্মমূর্তির ন্যায় পূজা করা হয়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে ধর্মদেবতাকে কূর্মরূপে ধর্মকে বন্দনা করা হয়েছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অথবা ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজা করা হয়ে থাকে। প্রধানত বাউড়ি, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি শ্রেণির মানুষেরা ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকে। জৈনগ্রন্থ *আচারাঙ্গ সূত্র* বর্ণিত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের কাব্যে বর্ণিত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের বর্ণনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই ধর্মমঙ্গলকাব্যের যে সকল সন্ন্যাসীদের দেখা যায় তাদের মধ্যে ছাই ভস্ম মাখা সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় - তিনি ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে রাঢ়বঙ্গে এইরূপ কিছু সন্ন্যাসীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলেন। ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের লৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলি এসে সম্মিলিত হয়েছে এই কাব্যের লোকায়ত কাহিনির মধ্যে। বৌদ্ধ দর্শনে 'ভাবনা-হিতজনক সপ্ত বিধি' নামক যে সকল বিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনের এই মতের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যখন রঞ্জা পুত্রলাভের চেষ্টায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। সুমলা রঞ্জাকে হরিশচন্দ্রের পুত্রলাভের কাহিনি শুনিয়ে; রঞ্জাকে পুত্রলাভের জন্য আরও উৎসাহী করে তোলে। এরপর বহু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে রঞ্জা ধর্ম দেবতাকে সন্তুষ্ট করে পুত্র লাউসেনকে লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনি কয়েকটি পালায় বিভক্ত থাকে। এই পালাগুলির প্রথম দিকের অংশে থাকে রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি। পরবর্তী পালাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে লাউসেনের উপাখ্যান। ধর্মমঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কাহিনিটি গড়ে উঠেছে লাউসেনের বীর গাথাকে কেন্দ্র করে। ধর্মঠাকুরের বাহন হল ঘোড়া। বিভিন্ন স্থানে হাতি এবং উলুককে ধর্মঠাকুরের বাহন হিসেবে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলে পোড়ামাটি ও কাঠের তৈরি ঘোড়া দিয়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করা হয়। গ্রামবাসীরা ধর্মঠাকুরের কাছে ঘোড়া মানত করে এবং ধর্মপূজার সময় মাটির ঘোড়া বলি দেওয়া হয়। অনার্য জাতির প্রভাবে অনার্য দেবতার ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ঘোড়ার যোগের একটু ইতিহাস রয়েছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যদেবতার সাদৃশ্য এবং সেই ভাবনা থেকে ধর্মপূজায় ঘোড়া মানত করা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। ধর্মদেবতার উপাসনা বা বন্দনার মধ্যে ধবল বা সাদা রঙের যোগ অনুমান করে। ধর্মঠাকুরের ভক্তরা সাদা ছাগল, সাদা মুরগী ও সাদা পায়রা বলি দিয়ে থাকে। এই সাদাবর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়তো ধর্মের অনুগামী সন্ন্যাসীরা শরীরে ছাইভস্ম মেখে থাকে। ধর্মের গাজন উৎসবের গান ও নাচগুলি স্পষ্টতই অনার্য সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। মাথার খুলি নিয়ে নাচ গাজনের একটি অঙ্গ, যাকে অনার্য সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত বলে মনে করা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজার উৎসবকে বলা হয় ধর্মের গাজন। বাংলার পল্লিগ্রামে শিবের গাজনের কথা জানা যায়। ধর্মের গাজনের সঙ্গে শিবের গাজনের কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বৌদ্ধ মতে শূন্য শব্দ থেকে দুই প্রকার প্রতীতি জন্মে। প্রথম অংশে ঘট শূন্য বলতে জলাদি আধেয়্যের অভাব বোঝা যায়, তবে এখানে ঘটাদির অবিদ্যমানতা বোঝায় না। দ্বিতীয় অংশে পট শূন্য বলতে বোঝায় সর্বশূন্যতা। বৌদ্ধধর্মের এই সর্বশূন্যতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ধর্মদেবতার সংযোগ লক্ষ করা গেছে। এইভাবে ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের লোকায়ত উপাদানের সমাহার দেখা যায়। একইভাবে মনসা, শিব, চণ্ডী ও মঙ্গলকাব্যের প্রধান এবং অপ্রধান সকল দেবতাদের মধ্যেই এইরূপ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের দেবতাদের লোকায়ত উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়।

ভারতবর্ষে পূর্বকাল থেকে চলে আসা বৌদ্ধ এবং সামান্য কিছু জৈনধর্মের প্রভাব ছিল। এই অবস্থায় বিদেশী শক্তির আক্রমণে মানুষ একসঙ্গে ধর্মসঙ্কট ও অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। তখন মানুষ যে কোন উপায়ে নানাবিধ লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এই টিকে থাকার জন্য তারা তাদের পাশাপাশি চলে আসা সমাজের অন্যান্য ধর্মীয় ভাবানা ও বিশ্বাসগুলিকে আঁকড়ে

ধরতে চেয়েছে। সমাজের এই সকল ভাবনাগুলিকে সমাজের কিছু মানুষ সাহিত্যে রূপদান করেছে। যেখানে উঠে এসেছে পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবতাদের পরিচিতি। ফলে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের চরিত্রে এবং গল্পের কাহিনিতে মিশ্রসমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক সকল বৈশিষ্ট্যেগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়: মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন ভাবনার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

প্রাচীন ভারতের বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটতে শুরু করেছিল। সমাজের এই বিশেষ সময়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় এক যুগ্ম ভাবনা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মঙ্গলকাব্য বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথমদিকের জৈনধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলনের কথা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখায় তন্ত্রভাবনার বৌদ্ধ দেবতাদের রূপকল্পনার দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে। ত্রয়োদশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিপুল পরিবর্তন আসতে থাকে। তুর্কী আক্রমনোত্তর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে যায়। নতুন আবির্ভূত ধর্মের দৈবী পরিকল্পনায়, অবসিত বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের দৈবীকল্পনার ছাপ থেকে যায়। এই নবাগত সমন্বিত সমাজের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত যুগ্ম ভাবনাগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে।

সমাজে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অস্তিত্ব বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের শেষ হয়। সূচনা হয় মধ্যযুগের যেখানে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় সাহিত্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিতি পায়। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধরা পড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন সত্তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের গুণকীর্ত্তন। প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য হল মনসামঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেবী চরিত্রের বর্ণনা ও দেবীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। জৈনদের দেবী পদ্মাবতী যিনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবীর সাহচর্যে সাপেদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জৈনপন্থীরা বিশ্বাস করে এই দেবীর নাম মনে করলেও সাপের ভয় দূরে থাকে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে তাদের জাঙ্গুলী দেবীর নামে সাপেরা পালিয়ে যায়। *সাধনমালা* গ্রন্থে উচ্চারিত একটি মন্ত্রের কথা জানা যায়, যেখানে বলা হয়েছে এই মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে সাপের মাথা সপ্তধা স্ফুটিত হতে থাকে। বিজয়গুপ্তের রচিত মনসামঙ্গলকাব্যের নাম পাওয়া যায় *পদ্মপুরাণ*। কবি নারায়ণদেব ও তার মঙ্গলকাব্যের নামকরণ

করেছিলেন *পদ্মপুরাণ*। মনসামঙ্গলকাব্যের এই নামকরণের মধ্যে জৈনদেবী পদ্মাবতীর প্রভাব রয়েছে এমনটা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ বিনয়বস্তুর অন্তর্গত *মহামায়ূরীবিদ্যা সূত্র*-তে মনসাদেবী যেই রূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তান্ত্রিকদের কল্পিত দেবীরূপ সাধকের মানসলোকে উৎপন্ন হয়ে আধ্যাত্ম মহিমায় ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে আসলে সেই দেবীরূপ কবিদের মনসাদেবীর রূপ চিন্তনে সাহায্য করেছে। বাঙালির নারীদের চরিত্রে স্বামীপ্রাণা ও ভক্তিপূর্ণ মনোভাব তৈরি করতে মনসামঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্রটি অনেকার্থে সাহায্য করেছে। একইভাবে মনসা, চণ্ডী, ধর্মমঙ্গলকাব্য এছাড়াও প্রধান এবং অপ্রধান সকল মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মধ্যেই এইরূপ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

প্রাচীন ভারতে প্রতিবাদী ধর্মগুলির মধ্যে জৈনধর্মমত সবথেকে বেশি হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপস করে নিয়েছিল। প্রথম স্তরে এই ধর্মমতটি কতকগুলি নৈতিকতার বিষয়কে সামনে রেখে এগোলেও পরবর্তীতে এই রীতির বদল ঘটেছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব পর্ব থেকে শুরু করে তাঁর ধর্ম প্রচারকালের মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধের বাংলাদেশে প্রবেশের কথা সঠিকভাবে জানা যায় না। এক সময়ে বেদবিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করলেও। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলে বৈদিক সংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রম পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সমাজে স্তিমিত হতে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে জৈনরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রধান আকর্ষণ ছিল সর্বধর্মের লোকেদের কোন রকম বিভাজন না করে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে – অনুশীলন, আচার, ধর্মচর্চা ও সাধনার উপরে সকল আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে। জন্মগত বা বর্ণগত কারণ এখানে কোনোরকম গুরুত্ব পায় না। এছাড়াও পূর্ব সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি নবাগত সমাজের মধ্যে দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত জাতকর্ম পালন করার রীতি যা পূর্ব সমাজ থেকেই গৃহীত। জৈনধর্মের মধ্যে মানব শিশু জন্মকালে কিছু মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। জৈনরা বিশ্বাস করে পিতা-মাতার কাছ থেকে আমরা যে দেহ ধারণ করি সেটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আমাদের পূর্ব কর্মফল থেকে

মানব কেমন শরীর ধারণ করবে সেগুলি নির্দিষ্ট করা হয়। তারা শিশু জন্মগ্রহণ করলে লোকায়ত কিছু কর্মের মাধ্যমে নবজাত শিশুর সম্বর্ধনা করে থাকে। বৌদ্ধগৃহীরা নবজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই সন্তানকে অভ্যর্থনা জানাতে বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। এই উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে গৃহী তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে সুখবর পৌঁছে দিয়ে থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে নবজাত শিশু এবং তার মা উভয়কে পরিষ্কার জলে ধুয়ে স্নান করানো হয়। প্রসূতির গৃহে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ন্যায় কিছু লোকাচার পালন করে থাকে। যেমন - চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর জন্মগ্রহণের সময়ে সূতিকাগৃহে আগুন জ্বেলে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুলিতে গৃহীরা জাতকর্ম হিসেবে যেই সকল লোকাচার পালন করে থাকে, সেগুলি পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। একইভাবে মঙ্গলকাব্যের সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করে ধর্ম, ভাষা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়গুলি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের আর্য-ভাষাভাষী সমাজ ভাবনার মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল মূলত ধর্মকে আশ্রয় করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বা মহাবীরের সময় পর্যন্ত জৈনধর্ম গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতীয় সমাজে। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব এবং তার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম। এই দুইয়ের মধ্যে কিছু সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ধরা দেয়। পূর্বকাল থেকে চলে আসা হিন্দুসমাজ, জৈনসমাজ ও বৌদ্ধসমাজ এই তিনটি সমাজের সাংস্কৃতিগত সাদৃশ্যের ছবি মঙ্গলকাব্যের সংস্কৃতির মধ্যে জায়গা দখল করেছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের ঘিরে গড়ে ওঠা পূজাপদ্ধতি যা পূর্ব সমাজের পূজাপদ্ধতির কথা মনে করায়। জৈনধর্মের মধ্যে বিভিন্ন দেবতার পূজা প্রচলন শুরু হয়েছিল, যেমন - দেবী পদ্মাবতী, জৈনদেবী অম্বিকা ও ইত্যাদি। জৈনরা তীর্থঙ্করদের শাসনদেবীদের পূজা করত সংসারের মঙ্গল কামনায়। জৈনরা তীর্থের আদর্শ ও তীর্থের বাণী বিশুদ্ধ মনে শ্রবণ করত। জৈনদের 'শম্বস্বরী ব্রত', যার অর্থ হল ক্ষমাদান করা। ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর চার-পাঁচ শতক পর থেকে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই মূর্তির পূজা করার রীতি দেখা যায়। যেমন - অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি শুধুমাত্র বুদ্ধের এই পাঁচপ্র কার ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। এখানে জৈনদের শাসনদেবীর ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে পাঁচজন শক্তি দেবী, যথা – লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডুরা ও

আর্য্যাতারিকা। এই পাঁচজন শক্তিদেবীর সঙ্গে বোধিসত্ত্ব রূপও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৌদ্ধরা তাদের পূজা ভাবনার মধ্যে শুভ এবং অশুভ বোধের কল্পনায় দেবতার মূর্তি জুড়ে দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাভাবনাতেও এই শুভ ও অশুভ শক্তির উপস্থিতির কথা জানা যায়। এই দেবতাদের বিবিধ পূজাপদ্ধতির নমুনাও পাওয়া যায়। একইভাবে মঙ্গলকাব্যের সংস্কৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সংস্কৃতিগত উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

শিবমূর্তি গঠন নিয়ে একাধিক ধর্মীয়সম্প্রদায়ের ধারণা একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার নিদর্শন পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের শৈবদেবতার মধ্যে। মহারাষ্ট্রে কৃষি ও পশুপালনের দেবতা ছিলেন খাণ্ডোবা, যিনি মূলত একজন স্থানীয় দেবতা। এই খাণ্ডোবা দেবতার রূপকল্পটি খানিকটা হিন্দুদেবতা শিবের ন্যায়, এই দেবতার পূজাও শিবপূজার মতো হয়। ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কিছু অংশে শিবপূজার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করা যায়। নেপালে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র্যতা। নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। নেপালের পালপা জেলার মহামরিয়ুনযায়া শিবাসন নামক স্থানে ভগবান শিবের একটি সর্ব বৃহৎ ধাতব মূর্তি পাওয়া যায়। এই শিবের মূর্তিতে রয়েছে গলায় সাপ, মাথার ওপর জটা বাধা, হাতে ত্রিশূল ও ডমরু। বাংলাদেশের ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। যেখানে শিব মূর্তিগুলির মধ্যে একই ধরণের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন অটুট রয়েছে। শিবের সঙ্গে তার বাহন নন্দী রয়েছে সর্বদা। এই শিব মূর্তির তিনটি মুখ, বারোটি হাত, হাতে থাকছে কপোল, ত্রিশূল এবং ডমরু।

ভারতবর্ষের বাইরে চীনে কিছু তন্ত্রসাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই তন্ত্রের দেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন চুন্দা দেবী। এই দেবী শুক্লবর্ণা, এই দেবী তার স্বচিহ্ন অক্ষসূত্র থকে কমণ্ডলু পর্যন্ত ঝোলানো থাকে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চুন্দাদেবীর একটি মূর্তি সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দেবীর দুটি হাত, একটি মুখ এবং দেবী শুক্লবর্ণা। বজ্রযানে বৌদ্ধদের মতে তাদের দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধকে সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র বলে মনে করে। আদিবুদ্ধ দেবতাকারে কল্পিত হয়েছে বজ্রধর নামে। তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। এই দেবতার মূর্তিতে থাকে দুটি হাত, যা বক্ষের উপর বজ্রহূঁকার মুদ্রায় সজ্জিত থাকে। দক্ষিণ হাতে থাকে বজ্র ও বাম হাতে থাকে ঘণ্টা।

পরিধানে থাকে বিচিত্র বস্ত্রাদি এবং তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত অবস্থায় থাকেন। এই দেবতার শক্তি কোথাও কোথাও প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যুগনদ্ধ মূর্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে কপোল থাকে। বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। এখানে থাকে একটি একক মূর্তি ও অপরটি হল যুগনদ্ধ মূর্তি। একটি হল শূন্যমূর্তি ও অপরটি হল বোধিচিত্ত মূর্তি।

শিল্পশৈলীর দিক থেকে একটি অনিন্দ্যসুন্দর একটি পার্শ্বনাথ মূর্তি বাংলাদেশের দিনাজপুরের জাদুঘরে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। এই মূর্তিটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে পদ্মের উপর দন্ডায়মান থাকে। এই তীর্থঙ্কর মূর্তির মাথার ওপর সর্বদা একটি পূর্ণফণা বিশিষ্ট সপ্তবাসুকিনাগের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই তীর্থঙ্করের পার্শদেবতা দিকপালদের প্রাণির উপরে চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। শাসনদেবী চক্রেশ্বরীকে তার বেদির নীচে অবস্থান করতে দেখা যায়। জৈনদের তেরোতম তীর্থঙ্কর বিমলনাথ। যার মূর্তি পাটনা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হতে দেখা যায়। এই মূর্তিটি আলূরা ভঙ্গিমায় অবস্থান করে। মূর্তিটির সঙ্গে প্রতীক হিসেবে থাকে জম্বু কেবলরক্ষ, এবং তীর্থঙ্করের শাসনদেবতা ও দেবীরূপে উপস্থিত থাকে সন্মুখ ও বিদিতা। জৈনদের ষোলতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ–এর একটি মূর্তি সংরক্ষিত হতে দেখা গেছে বাংলাদেশের বরেন্দ্র মিউজিয়ামে। এই মূর্তিটি বাংলাদেশের গোদাগাড়ির মানদৈল অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই জৈন মূর্তিটিকে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দেখা যায়। এখানে তীর্থঙ্করের হাত দুটি খোলা অবস্থায় থাকে। শরীরে কোন পোশাক নেই, মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো আবস্থায় দেখা যায়। এই মূর্তির সঙ্গে দুটি পুরুষ মূর্তি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় উপস্থিত থাকে। এই তীর্থঙ্করের বেদির নীচে গণেশ মূর্তিসহ নবগ্রহ মূর্তি খোদিত থাকতে দেখা যায়।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের তাম্রপটে জৈন আচার্যদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সমাজে জৈন গৃহীদের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের পূর্বে জৈনদের আগমন ও প্রসার ঘটেছিল। বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবতার মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে গড়ে ওঠা দৈব রূপকল্পনায় সাদৃশ্য বজায় থাকতে দেখা গেছে। সকল ভিন্ন ধর্মীয় সমাজগুলি গড়ে উঠেছিল আসলে একই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দেবী সরস্বতীর কথা। ভারতীয় মঙ্গলকাব্য, বৌদ্ধ ও

জৈনদের মধ্যেও এই দেবী বিভিন্ন নামে লক্ষ করা যায়। ভারতের বাইরে জাপান ও চীনেও পাওয়া গেছে বিদ্যার দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে। তবে সকল সরস্বতীরূপী মূর্তির মধ্যে পাওয়া গেছে পুস্তকের যোগাযোগ। ভারতের বাইরে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গেও ভারতীয় বৌদ্ধ ও জৈনদের অস্তিত্ব একইভাবে বজায় থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহযোগে।

উপসংহার

সময়-পরিসরের পারম্পর্য এবং গ্রন্থনা হিসেবে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনা: পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদান সন্ধান ও বিশ্লেষণ' গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একাধিক ধর্মীয় মতাদর্শের প্রাধান্যতা ভারতীয় সমাজভাবনার বিষয়ে শুধুমাত্র সমকালকেই প্রভাবিত করেনি, এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় সমাজের উত্তরকালের মধ্যেও। ফলে ভারতীয় সমাজ গঠনের মূলে পরিলক্ষিত হয়েছে মিশ্রধর্মীয়-সংস্কৃতির মেলবন্ধন। এই সমাজে গড়ে ওঠা সাহিত্যের মধ্যে এই মিশ্রসংস্কৃতির ধারণাগুলি নিমজ্জিত রয়েছে - সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় আচরণবিধি, নারীদের পূজাপদ্ধতি, দেবতাদের মূর্তিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা এই সুদীর্ঘ গবেষণা পরিকল্পনার পরিধিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও বৌদ্ধধর্মের শাস্তা গৌতমবুদ্ধ দুজনেই পূর্ব ভারতের মনীষী ছিলেন। তাঁদের ধর্মের প্রচারভূমি প্রাচ্যদেশের (মগধ, মিথিলা ও অঙ্গ) মধ্যেই সীমিত ছিল না। তাঁদের ধর্মীয় মতাদর্শের প্রভাব বাংলার মাটিতেও নেমে এসেছিল কিছুটা সময়ের ব্যবধানে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই দুই ধর্মের পূর্বকালে প্রচলিত ছিল পুরাতন আর্যধর্ম। যা বেদবাহ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এই তিনটি ধর্মীয় মতাদর্শকে সমাজের মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখতে নানাবিধ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে ধর্মগুলি হারিয়ে ফেলেছে তাদের নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি। সকল ধর্মীয় মতগুলির মধ্যে ঘটে গেছে এক আশ্চর্য সংযোগসাধন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করে জীবনে ত্যাগ ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে কর্মের সাধনা করা প্রয়োজন। একইভাবে মহাবীরের উত্তরকালে গৌতম বুদ্ধ এই ধারণাকে তাঁর নিজের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ-এর প্রচলিত ধর্মমত দুটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতভূমিতে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। কালের নিয়মে এই দুই ধর্মীয় মতাদর্শের অবসান ঘটেছে ঠিকই কিন্তু

নবআগত ধর্মমতের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বীজ বপন করে রেখে গেছে। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছিল। এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আগমনের পরেই সামজে উঁচুনীচু ধর্মীয় ভেদাভেদ মুছে গিয়ে সমাজকে এক স্থির ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে এসে মিলিত হতে দেখা গেছে। জৈন ও বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে রূপবদল করে নিজেদের রক্ষা করেছে। এই সময়কালের মধ্যে লিখিত হওয়া সাহিত্যের মধ্যেও এই স্মৃতি কাহিনি উল্লেখ হতে দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের অসম নীতি-ব্যবস্থা এবং শাসকের কর্মবিধির ওপর নজরদারি এই দুই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্য ভাবনার একটি অংশ। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের ধারায় মধ্যযুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে মঙ্গলকাব্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রাচীন যুগের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি বৃদ্ধি করতে বৌদ্ধ ও জৈনযুগের ধর্মীয় সাহিত্যগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। মানুষের নিজের পাওয়া না পাওয়ার কাহিনি যেমন এখানে জোরালো হয়েছে। সমাজের পৌরাণিক দেবতাকে সরিয়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল নবাগত দেবতাদের সেকথাও জানানো হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে দেশ-জাতি-সত্তার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দুটির প্রচলন হলেও, জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে খুব একটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে আলোড়িত করেছিল। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্মের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা খুব বেশি দেখা যায় না। বর্তমান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈন ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত ধর্মমত আরও বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতে প্রথমে বৈদিক যুগের সূচনা হয়, যেখানে কিছু মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে সমাজের নিয়ম-কানুনের বহর বাড়িয়ে তোলে। বৈদিক নিয়মের দ্বারা শোষিত সমাজ পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। সমাজে এই পরিবর্তন আসে বৈদিক ধর্মের বিরোধী দুই ধর্মের হাত ধরে। এরপর বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যেখানে একটি নবাগত মিশ্রধর্মীয় সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। মানুষ দীর্ঘদিন বৈদিক ধর্মের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে গিয়ে এক সময় যেমন বেছে নিয়েছিল বেদবিরোধী ধর্মীয় মতাদর্শগুলিকে। বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্মের দীর্ঘকাল অবস্থানের পর তাদের

কলুষিত হয়ে ওঠা সমাজ থেকে মানুষ পরিত্রান পেতে আবার ভিন্নধর্মের সাহায্য পেতে আগ্রহী হয়। ভারতীয় সমাজে গড়ে ওঠে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ। যা সমকালীন লেখকদেরও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে রসদ জুগিয়েছিল।

সমাজের প্রতিনিধিশ্রেণির একদল মানুষ সেই সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ তাদের এই অবস্থার কথাকে সাহিত্যে রূপদান করেছে নিজেদের অস্তিত্বের কথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। তারা মঙ্গলকাব্যগুলি গড়ে তুলতে গিয়ে পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবতাদের আশ্রয় নিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের চরিত্রে এবং গল্পের কাহিনিতে মিশ্রসমাজের ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। এই শ্রেণির কবিরা নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ও লোকায়ত বিশ্বাসকে কাব্য মধ্যে এনে জুড়ে দিয়েছে। সেগুলির সঙ্গে নিজ ধ্যান-ধারণাগুলির মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা গ্রহণ করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের পৌরাণিক ও লৌকিক সকল বৈশিষ্ট্যেগুলিকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত সম্ভব হয় নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেখানে মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে পূর্বতন সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবনাগুলি স্থান দখল করে রয়েছে। যা সহবস্থানের ফলে প্রকৃতির নিয়মেই সংঘটিত হয়েছে। দেশের বাইরেও এই ধর্মীয়ভাবনাগুলি নিজেদের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। ওই দেশের পূর্ব প্রচলিত ধর্মীয়ভাবনাগুলিকে বিলোপের মধ্যে দিয়ে, কোনো দেশে সেই অঞ্চলের স্থানীয় ধর্মীয়ভাবনাগুলির মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। একইভাবে জৈনধর্ম নিজের অধিকার বিস্তার করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুরের তাম্রপটে জৈন আচার্যদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সমাজে জৈন গৃহীদের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের পূর্বে জৈনদের আগমন ও প্রসার ঘটেছিল। বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবতার মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে গড়ে ওঠা দৈব রূপকল্পনায় সাদৃশ্য বজায় থাকতে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দেবী সরস্বতীর কথা। ভারতীয় মঙ্গলকাব্য, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে এই দেবী বিভিন্ন নামে ধরা দিয়েছেন।

সকল দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন এই সকল ধর্মগুলি বহুকাল পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে সকল ধর্মগুলির মধ্যে মতবাদের আদান-প্রদান হয়েছিল। হিন্দুমতে যাকে কৈবল্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, বৌদ্ধমতে সেটা নির্বাণ নাম পেয়েছে। একইভাবে সমাজে জৈনধর্মের আচরিত রীতি ও প্রথাগুলির ছাপ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তুর্কী আক্রোমণোত্তর দু'শো বছর পরে বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। এই সামাজে সরাসরি বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের প্রভাব সেভাবে চোখে পড়ে না। সমাজের অন্তঃস্থলে তখনও জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। তুর্কী আক্রমণের (১২০১ খ্রিস্টাব্দ) ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। আর্য-অনার্য গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সমন্বয় ঘটেছিল যাকে সংক্রান্তিকাল বলা হয়েছে, তুর্কী আক্রমণ এই প্রক্রিয়াকে সংঘটিত করতে অনুঘটকের কাজ করেছিল। সবদিক থেকে বিপর্যস্ত উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পর্ব অত্যন্ত জরুরি। অনার্য লোকায়ত অন্ত্যজ দেবতারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্যদেবতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পর প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছে। নিম্নবর্ণের দেবতাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছিল। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম–বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে পড়েছিল, এবং নবাগত আদর্শের প্রতি মানুষের আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হতে থাকে। রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে না; তাঁদের নূতনকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরাতনেরই রূপান্তর হয়ে রইল। এই নূতন পুরাতনের মিশ্রণের ভাবনায় উৎপন্ন দেবতারা নাম পেয়েছিল মিশ্রসত্য দেবতা। জৈন এবং বৌদ্ধরা ভক্তিসহকারে যে সকল দেবতাদের পূজা করে থাকে। হিন্দুরা সেই সকল দেবতাদের নাম পরিবর্তন করে নিজেদের পূজ্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। একইভাবে জৈন ও বৌদ্ধ আচার-বিধিগুলিকে মধ্যযুগের সমাজ নিজেদের প্রয়োজন মতো সামান্য অদল-বদল করে নিজেদের সংস্কৃতি বলে বহন করে চলেছে।

হাজার বছরের পুরোনো নির্বাচিত গ্রন্থগুলি পাঠের পরে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া যায় যে চলমান সমাজে সাংস্কৃতিক আচার রীতি-পদ্ধতিগুলির থাকে এক বিশেষ প্রবাহমানতা। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাপ্ত দেবতাদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যুগ যুগ থেকে চলে আসা জৈন এবং বৌদ্ধ দেবদেবীদের

আচার-আচরণগত বিষয়ের সাদৃশ্য। সময়ানুক্রমে দেখা যায় সমাজের অভ্যন্তরে এই গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। যেগুলিকে সাহিত্যের মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ করে মিশ্রসংস্কৃতির ব্যাপারে আরও স্পষ্ট ধারণা পোষণ করা যেতে পারে। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং হিন্দু ও জৈনদের মিশ্রসংস্কৃতিতেও এমনটাই ধরা পড়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির বাইরে রয়েছে পুনরায় উত্থিত নব্য-ব্রাহ্মণ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরে রয়েছে হাজার বছরের পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্য। যা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মূল অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে একাধিক সময়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি সামাজিক রীতি-নীতির ও পরিবর্তন ঘটেছে। যা অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম প্রকৃতির। সমাজের আচারপদ্ধতিগুলির মধ্যে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। যেগুলি সামান্য রূপান্তরিত হয়েছে নতুন সমাজে এসে তবে মূল বিষয়বস্তু আসলে একই রয়ে গেছে। একটি সমাজ ভাবনা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ ভাবনা ও সংস্কৃতি এসে মিলিত হয়ে যে সমাজভাবনা বেশি যুগোপযোগী ও ক্ষমতাশালী হতে পারে সেই টিকে থাকে। সেই সমাজভাবনাগুলি এগিয়ে যাওয়ার পথকে আরও প্রশস্ত করে। জন্ম দেয় এক মিশ্রসমাজ ও মিশ্রসংস্কৃতির। এই মিশ্রসমাজভাবনার মধ্যে আগত সকল 'দৈবী' ভাবনার মধ্যেও থাকবে একাধিক ধর্মীয় সমাজের দৈবীপরিকল্পনা। বাংলা সাহিত্যের ধারায় আলোচিত হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু ও জৈন সমাজ-সংস্কৃতির ধারাগুলিকে পরস্পর বোঝার জন্য এই মঙ্গলকাব্যগুলি খুব সহায়ক মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একাধিক ধর্মীয়ভাবনার সংমিশ্রণের ধারণাকেও এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সময় এবং সময়ের পাঠক্রমকে ধারণ করে রয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলি। এই শিল্পসাহিত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করেই অতিক্রান্ত সময়ে এসে দাঁড়িয়েও সেই সময়কাল ও সমাজভাবনাকে অনুধাবন করা যায়। মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ ও জৈন দেবভাবনার পৌরাণিক ও লোকায়ত উপাদানগুলি সন্ধান ও বিশ্লেষণের মধ্যেই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজটি যুক্ত থাকতে সচেষ্ট হয়েছে।

উপসংহারের শেষে পরিশিষ্ট অংশে কয়েকটি হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈন দেবতার চিত্র যোগ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত এই চিত্রগুলি গবেষণা পত্রে আলোচিত দেবতাদের রূপায়ন ও পর্যায়ক্রমকে বুঝতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

জ্ঞানবজ্র, কর্মা (দাস, রামকৃষ্ণ) (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত।

দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) (২০০৯)। *মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশ গুপ্ত, তমোনাশ (সম্পাদিত) (২০১১)। *সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) (১৯৬২)। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত) (১৯৫৭)। *অভয়ামঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (২০১৫)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ।

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ–চণ্ডী।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি (সম্পাদিত) (২০১১)। *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০০২)। *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদিত) (২০১০)। *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পাদিত) (২০০০)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

ভট্টাচার্য্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) (১৯৬৫)। *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (১৯৬০)। *হরিদেবের রচনাবলী রায় মঙ্গল ও শীতলা মঙ্গল*। সাহিত্য প্রকাশ–৪। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

মহাপাত্র, পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) (২০১২)। *ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রী ধর্মমঙ্গল*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, অতনুশাষণ (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শীতলামঙ্গল সমগ্র*। কলকাতা: দশদিশি।

রায়, বসন্তরঞ্জন (সম্পাদিত) (১৩১৬)। *মনসামঙ্গল কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত*। কলকাতা: বঙ্গবাসী- ইলেক্ট্রো।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত)। *কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

হালদার, যোগিলাল (সম্পাদিত) (২০১২)। *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভিধান

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ ও আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত) (২০০৫)। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৭৮)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড অ-গ। নিউ দিল্লী – সাহিত্য অকাদেমি।

সরকার, সুধীরচন্দ্র (সম্পাদিত) (১৩৭০)। *পৌরাণিক অভিধান।* কলকাতা: এম. সি. সরকার. অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হক, মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, সরকার, স্বরোচিষ (সম্পাদিত)। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ (২০১০)। *সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে*। কলকাতা: পারুল প্রকাশনী।

গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ (১৯৯৪)। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

গনী, ওসমান (২০০০)। *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি*। কলকাতা: রত্নাবলী।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* । কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

গুপ্ত, মনীন্দ্রভূষণ (১৪০৭)। *সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

গোস্বামী, অচ্যুত (১৯৬১)। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: পাঠভবন।

গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ (অনূদিত) স্মৃতিতীর্থেন, কৃষ্ণচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০৬)। *শ্রীমদ্ভাগবত্*। কলকাতা: গিরিজা।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (২০০৮)। *জাতক-মঞ্জরী*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪০৮)। *জাতক*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১১)। *জাতক*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১৪)। *জাতক*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, ইশানচন্দ্র (অনূদিত) (১৪১৪)। *জাতক*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

ঘোষ, তপনকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা ভাষায় জৈনধর্ম চর্চা*। কলকাতা: প্যাপিরাস।

ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৃন্দাবন দাস-বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ঘোষ, সুবীর (২০১১)। *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়*। কলকাতা: পশ্চিম বাংলা অকাদেমি।

চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ (২০১০)। *নিবন্ধ সংগ্রহ-১ তন্ত্র*। কলকাতা: গাঙচিল।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পাদিত) (২০০৫)। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১১)। *লোককথার সাতকাহন*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ড্রিষ্ট্রিবিউট।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (২০১২)। *বাংলার ব্রত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯)। *গৌড়ের ইতিহাস* । প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত (২০১৭)। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম* । কলকাতা: আনন্দ।

চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য*। কলকাতা: চিরায়ত।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার (১৯৮৫)। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৫)। *জয়দেবের গীতগোবিন্দম্*। কলকাতা: দেব–প্রেস।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৩)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৮)। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদিত) (২০০৪)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ*। কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর।

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র নাথ ও চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বৌদ্ধ সাহিত্য*। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ। কলকাতা: মহাবোধি।

চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ও দেবপ্রসাদ, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন (সম্পাদিত) (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

চৌধুরী, সাধনকমল (১৮১২)। *মহাবংশ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল (২০০৫)। *থুপবংশ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সাধনকমল (২০১৭)। *ইতিহাসের আলোয় গৌতম বুদ্ধ* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

চৌধুরী, সাধনকমল (অনূদিত) (১৪০৯)। *বিশুদ্ধ সূত্তনিপাত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪)। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

জ্ঞানবজ্র, কর্মা (অনূদিত) (২০১৭)। *ধম্মপদ*। কলকাতা: তথাগত।

ঝাঁ, শক্তিনাথ (১৯৯৯)। *বস্তুবাদী বাউল উদ্ভব সমাজ সংস্কৃতি ও দর্শন*। কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী।

ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ (অনূদিত) (১৪০৭)। *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৭) চৌধুরী, সুকমল ও ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব*। *Introducing Mahayan Buddhism*। কলকাতা: The Asiatic society।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ (১৪১৮)। *বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ (সম্পাদিত ও অনূদিত) (১৯৬১)। *ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) বাৎস্যায়ন ভাষ্য*। প্রথম খণ্ড।

তেওয়ারী, হরিপ্রসাদ ও তেওয়ারী, নৃসিংহবাদ (২০১৯)। *ভগবান মহাবীরের সিদ্ধভূমি ও জৈন কালচক্র*। কলকাতা: সোমলতা।

ত্রিপাঠী, যদুপতি ও ত্রিপাঠী, অশ্রুলেখা (সম্পাদিত) (২০১৫)। *ভারতীয় দর্শন পরিচয়*। কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন।

দত্ত, অক্ষয় কুমার (১৩১৮)। *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দত্ত, অক্ষয় কুমার (১৪১৩)। *ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

দত্ত, রমেশ (১৪০৩)। *প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড: প্রথম ভাগ। কলকাতা: দীপায়ণ।

দত্ত, শ্রীরমেশ চন্দ্র (অনূদিত) (১৮৮৬)। *ঋগ্বেদ সংহিতা*। চতুর্থ অষ্টক। কলকাতা: কলকাতা: গবর্নমেন্ট যন্ত্রে মুদ্রিত।

দাশ, আশা (১৯৬৯)।*বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস।

দাশ, আশা (রচিত) বড়ুয়া, সুমিত (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ছোঁয়া।

দাশগুপ্ত, অংশুপতি (অনূদিত) (২০০৫)। *অতীতের উজ্জ্বল ভারত*। A. L. Basham লিখিত 'The Wonder that was India' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

দাশগুপ্ত, তমোনাশ (১৯৫১)। *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাশগুপ্ত, নলিনিনাথ (১৩৫৫)। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: এ. মুখার্জী।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৪০৯)। *ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (২০০৪)। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

দাস, উপেন্দ্রকুমার (২০১০)। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার।

দাস, উপেন্দ্রকুমার (২০১১)। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

দাস, হরিদাস (সম্পাদিত) (১৪২১)। *শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

দুর্গাকিঙ্কর (১৩৭৭)। *সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ*। প্রথম অধ্যায়। কলকাতা: পাবলিসিটি প্রিন্টার্স।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত) (১৯৯৪)। *কবি-কঙ্কণচণ্ডী*। কলকাতা: রত্নাবলী।

নিগূঢ়ানন্দ (১৩৭৯)। *দেব দেউল ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

পাল, বিপদভঞ্জন (২০১৪)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (২০১৪)। *দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ*। ঢাকা: অন্যধারা।

বড়ুয়া, দীপক কুমার (২০০৮)। *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, প্রণবকুমার (২০০৭)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনূদিত) (বুদ্ধাব্দ ২৪৮৩)। *মধ্যম-নিকায়, দয়াধন-উমাবতী*। সিরিজ-৩। কলকাতা: যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড।

বড়ুয়া, বেণীমাধব (অনূদিত) (বুদ্ধাব্দ ২৫৫৫) চৌধুরী, হেমেন্দুবিকাশ (সম্পাদিত)। *নির্বাচিত রচনাবলী*। কলকাতা: বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, ব্রহ্মানন্দ প্রতাপ (২০১৩)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

বড়ুয়া, শিমূল (২০১২)। *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম*। বাংলাদেশ: অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

বড়ুয়া, সুধাংশুবিমল (২০০৮)। *বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা।

বড়ুয়া, সুমঙ্গল (অনূদিত) (১৩৪১)। *অঙ্গুত্তর-নিকায়*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

বন্দোপাধ্যায়, অমল কুমার (১৯২১)। *পৌরাণিকা*। প্রথম খণ্ড: অ-প। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম লিমিটেড।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৯৫)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি।

বন্দোপাধ্যায়, দেবাশিস (১৯৯৭)। *চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর*। কলকাতা: আনন্দ।

বন্দোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি (২০২০)। *হিন্দু কে*। কলকাতা: সূত্রধর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল চন্দ্র (১৯৬৬) / *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমোলকুমার (২০০১)। *পৌরাণিকা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর (১৪১৪)। *রাধা* । কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *কাশীদাসী মহাভারত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) (১৯৯২)। *পদ্মাবতী জায়সী ও আলাওল* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৪১৭)। *বাংলা সাময়িক-পত্র ১২৭৫ (ইং ১৮৬৮)—১৩০৭ (ইং ১৯০০)*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (১৯৬৭)।*বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

বসু, অঞ্জলি (সম্পাদিত) (২০১৫)। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বসু, কাবেরী (অনূদিত) রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

বসু, তারাপদ (২০০৬)। *নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল সমাজ ভাবনা*। বর্ধমান: রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ।

বসু, ত্রিপুরা (১৯৮৭)। *বিস্মৃত কবি ও কাব্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) (১৩১৪)। *শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিত প্রণীত*। কলকাতা: বিশ্বকোষ প্রেস।

বসু, মণীন্দ্রমোহন (২০০১)। *চর্যাপদ*। কলকাতা: সাহিত্য সেবক সমিতি।

বসু, যোগীরাজ (২০১৫)। *বেদের পরিচয়*। পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা: ফার্মা. কে. এল. এম.।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪১৮)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (১৪১৮)। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ (২০০৩)। *চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*। কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী।

বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, গৌতম (১৪১৫)। *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

বসু, সুজিতকুমার, মণ্ডল, সুধেন্দু, ভট্টাচার্য, সুতপা, দাস, নরেন্দ্রনাথ, ভট্টাচার্য, গৌতম (১৪১৫)। *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

বাগচী, প্রবোধচন্দ্র (২০০১)। *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর ও চৌধুরী সুরেশ (সম্পাদিত) (২০১৭)। *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী।

বিদ্যাভূষণ, সতীশ চন্দ্র (১৪১৩)। *বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন (২০১১)। *বুদ্ধদেব-চরিত* । কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

বিশ্বাস, দিলীপ কুমার (২০০৬)। *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। প্রবন্ধ সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী।

বেরা, নলিনী (২০১৯)। *সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

বোধি, ভদন্ত রাহুল (বিপশ্যনাচার্য) (২০০০, অক্টোবর)। *আদর্শ বৈদ্ধাঞ্জী আচারসংহিতা সম্যক দান*। মুম্বাই: ভিক্ষু সঙ্ঘাচে ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট মিশন।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (১৩৯৮)। *অভিধর্ম-দর্পণ* । অখণ্ড সংস্করণ। উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ষ্ট্রাষ্টি বোর্ড।

ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (বুদ্ধাব্দ ২৫২৭)। *বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা*। উত্তর চব্বিশ পরগণা: মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ষ্ট্রাষ্টি বোর্ড।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৯৬৩)। *ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী।

ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পাদিত) (১৪১৫)। *সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শন*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (১৪১৯)। *বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত) (২০১৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০০)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকসাহিত্য।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয় (অনূদিত) কোসাম্বী, ধর্মানন্দ (২০১৫)। *ভগবান বুদ্ধ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ, ভট্টাচার্য, সুমিত্রা, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০০)। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (রচিত) মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র ও ভিক্ষু, সুমপাল (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেব-দেবী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ (সম্পাদিত) ১৩৬২। *সাধনমালা।* প্রথম খণ্ড। জি. ও. এস. অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ, চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি (সম্পাদিত) (২০১৫)। *বৌদ্ধদের দেবদেবী।* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০০-২০০১)। *বৌদ্ধকোষ*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৪-২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৪–২০০৫)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, বেলা (কার্যকারী সম্পাদিকা) ও সম্পাদক মণ্ডলী (২০০৭)। *বৌদ্ধকোষ*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভট্টাচার্য, রমণচন্দ্র (২০০৩)। *গৌতম বুদ্ধ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন (২০২১)। *হিন্দুধর্মের দার্শনিক পটভূমি*। কলকাতা: সূত্রধর।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১২)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: গাঙচিল।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৩)। *প্রবন্ধসংগ্রহ – ৩* । কলকাতা: গাঙচিল।

ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) ও হালদার, মানসী (১৪১২ বঙ্গাব্দ)। *বারোমাসের মেয়েদের ব্রতকথা*। কলকাতা: দি সজল পুস্তকালয়।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । প্রথম পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । দ্বিতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (২০০৩)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* । তৃতীয় পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড।

ভেদানন্দ, স্বামী (১৩৫৩)। *আত্মজ্ঞান*। কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (২০০২)। *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স।

মজুমদার, শ্রীবিজয়চন্দ্র (১৯২৫)। *থেরীগাথা* । ঢাকা: সাধনা লাইব্রেরী।

মণ্ডল, ইন্দুভূষণ (১৯৯৯)। *বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক।

মহাস্থবির, ধর্মাধার (১৯৫৪)। *ধম্মপদ*। মূল ও বঙ্গানুবাদ। কলকাতা: ধর্মাঙ্কুর সভা।

মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার (বুদ্ধাব্দ ২৫৫৩)। *সদ্ধর্মের পুনরুত্থান*। কলকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

মিত্র, অমলেন্দু (১৪০৭)। *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর বীরভূমে প্রাপ্ত তথ্যালোকে*।

মিত্র, অশোক (২০১৪)। *ভারতের চিত্রকলা* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

মিত্র, কৃষ্ণকুমার (১৯৯৮)। *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪-২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধকোষ*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত (১৯৭৮)। *চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার (১৩৮৮)। *বাংলায় ধর্মসাহিত্যে লৌকিক উপাদান*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া (২০০৪)। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দা এশিয়াটিক সোসাইটি।

মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর (অনূদিত) মহাদেবন, টি. এম. পি. (২০১৮)। *শঙ্করাচার্য*। নিউ দিল্লী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া।

রত্নাগর, শিরিন (২০১৮)। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকায়*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

রায় আচার্য্য, সুচিত্রা (২০১৪)। *অশোক অভিলেখ*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রায়, নীহার রঞ্জন (১০৮২)। *বাঙালির ইতিহাস।* আদি পর্ব। কলকাতা: লেখক সমবায় সমিতি।

রায়, বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র (১৩৯৭)। বাঙ্গালা শব্দকোষ। কলকাতা: ভূর্জপত্র।

রায়, শরৎকুমার (১৪০৭)। *বৌদ্ধ ভারত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

লাহা, বিমলাচরণ (২০১৩)। *বৌদ্ধরমণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

লাহিড়ী-শর্ম্মণা, শ্রীযুক্ত দূর্গাদাস (সম্পাদিত) (১৩২৭)। *ওঁ বেদ ঋগ্বেদ-সংহিতা*। চতুর্থ অধ্যায়। হাওড়া: পৃথিবীর মুদ্রাযন্ত্র।

শরীফ, আহমেদ (২০০৫)। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

শাস্ত্রী, জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *ললিতবিস্তর।* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

শাস্ত্রী, শ্রীতীর্থপতি (সম্পাদিত) (২০১৮)। *খনার বচন*। কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ।

শাস্ত্রী, শ্রীরামনারায়ণ দত্ত ও ভট্টাচার্য, শ্রীদুর্গা প্রসন্ন (অনূদিত) (২০১১)। *শ্রী শ্রী চণ্ডী*। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৩৫৮)। *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* । কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ।* তৃতীয় খণ্ড। কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (১৪২২)। *বুদ্ধবাণী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (অনূদিত) (২০১১)। *দীঘ নিকায়*। (অখণ্ড) বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (অনূদিত) (২০১৫) পাল, সুমন (সম্পাদিত)। *সুত্ত নিপাত*। (অখণ্ড) বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—৬। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫)। *জৈন দর্শনের রূপরেখা* । কলকাতা: আর, এন, চ্যাটার্জি এন্ড কোং।

শ্যামাচরণ, পণ্ডিত (অনূদিত) (২০০৭)। *চণ্ডী-রত্নামৃত শ্রী শ্রী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সরল পদ্যানুবাদ*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর।

শ্রী শ্রী সত্যদেব, ব্রহ্মর্ষি (২০১০)। *সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য*। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস।

সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ (অনূদিত) (২০০৪)। *বুদ্ধ এবং তার ধম্ম অজ্ঞতাই দুঃখের মূল কারণ*। অষ্টম খণ্ড। নাগপুর: ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল।

সরকার, পবিত্র (সম্পাদিত) (২০০৫)। *বঙ্গদর্পণ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সমাজ-রূপান্তর সন্ধানী তৃতীয় সহস্রাব্দ সমিতি থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি ফর সোশ্যাল ট্র্যানজিশন।

সরকার, সাধনচন্দ্র (১৪০৪) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল (২০০৯) চট্টোপাধ্যায়, মলয় (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ দর্শন*। কলকাতা: চিরায়ত।

সাহা, বিপুল (২০১১)। *হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ*। কলকাতা: আশুতোষ লিথোগ্রাফিক কোম্পানি।

সিনহা, গোপাল চন্দ্র (২০০৮)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস।* প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

সেন, অতুল চন্দ্র তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ঘোষ, মহেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০০)। *উপনিষদ*। অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা: হরফ।

সেন, অমূল্যচরণ (১৯৯৯)। অশোকচরিত। কলকাতা: জীনরতন মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট।

সেন, কৃষ্ণবিহারী (প্রণীত) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (২০০৪)। *অশোক চরিত*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

সেন, ক্ষিতিমোহন (১৯৫৮)। *চিন্ময় বঙ্গ* । কলকাতা: আনন্দ।

সেন, ক্ষিতিমোহন (২০১০)। *হিন্দুধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত)। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, দীনেশ চন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, দেবব্রত (১৯৫৫)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

সেন, নবীনচন্দ্র (বুদ্ধাব্দ ২৫০০)। *অমিতাভ*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

সেন, প্রবোধচন্দ্র (২০০১) দত্ত, ভবতোষ (সম্পাদিত)। *বাংলার ইতিহাস সাধনা*। বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ—৯। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

সেন, রামদাস (১৯৯৭) ঘোষ বারিদবরণ (সম্পাদিত)। *বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ।

সেন, সুকুমার (১৪২৩)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, সুকুমার (১৯৪০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* । আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী।

সেন, সুকুমার (১৯৭০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।* প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সেন, সুকুমার (১৯৭৮)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

সেন, সুকুমার (২০১৪)। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেন, সুকুমার (২০১৬)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৫৬)। *চর্যাগীতি-পদাবলী* । বর্ধমান: সাহিত্যসভা।

সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৮৩)। *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী।

সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর (২০১৩)। *উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

সেনগুপ্ত, পল্লব (২০১১)। *পূজাপার্বণের উৎসকথা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

সেনগুপ্ত, সুকুমার (সম্পাদিত) ও সম্পাদক মণ্ডলী (১৯৮৫-৮৬)। *বৌদ্ধকোষ* । ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ (অনূদিত) (২০১০)। *বুদ্ধবংশ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

স্বামী, সমণ পুন্নানন্দ (২০১৭)। চৌধুরী, সুকমল ও ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। *পালিভাষা ও পালি ত্রিপিটক*। Buddha And Buddhism. কলকাতা: The Asiatic society।

হাজরা, কানাইলাল (২০১৪) ভিক্ষু, সুমনপাল (সম্পাদিত)। *আদিবুদ্ধ*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* । বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – ৪। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

হালদার, অসিতকুমার (২০১০)। *অজন্তা*। কলকাতা: লালমাটি।

হোসেন, সেলিনা (২০১৮)। *পছন্দের পাঁচ উপন্যাস*। কলকাতা: দিয়া।

ইংরেজি গ্রন্থ

Akira, Hirakawa (2017) Paul, Groner (translated and edited). *A History of Indian Buddhism/ From Sakyamuni to early Mahayan.* New Delhi - Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Banerjee, Biswaanath and Chaudhuri, Sukomal (edited) (2017). *Buddha and Buddhism.* Kolkata: The Asiatic Society.

Barua, Sudhanshu Bimal (1991). *Studies in Tagore and Buddhist Culture.* Kolkata: Sahitya Samsad.

Basu, Ratna (edited) (2007). *Buddhist Literary Heritage in India: Text and Context.* New Delhi: National Mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Bhattacharyya, Benoytosh (edited) (2013). *The Indian Buddhist Iconography.* New Delhi: Cosmo Publication.

Bhattacharyya, Benoytosh (1958). *The Indian Buddhist Iconography.* Calcutta: Firma, k. L. Mukhopadhyay.

Bhattacharyya, Benoytosh (1964). *An Introduction to Buddhist Esoterism.* Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Studies Vol. XLVI, Chowkhamba Sanskrit Series Office.

Bompas, C.H. (2006). *Folklore of the Kolhan* Kolkata: Asiatic Society.

Chakrabarti, Uma (2015). *The Social Dimensions of Early Buddhism.* New Delhi: National Mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Chand, Bool (1987). *Lord Mahavira* [A study in Historical Perspective]. Varanasi: Vivek Printers.

Chand, Bool (1987). *Lord Mahavira* [A study in Historical Perspective]. Varanasi: Vivek Printers.

Chattopadhyaya, Debiprasad (2010) Chimpa, Lama & Chattopadhyaya, Alaka (Transleted and Edited). New Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Pvt. Limited.

Chaudhuri, sukomal (1983). *Analytical Studi of The Abhidharmakosha.* Kolkata: Firma K. L. M Pvt. Limited.

Coomaraswamy, Ananda K. (2003). *Buddha and The Gospel of Buddhism.* Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.

Dharmapala, Angarika Hewavitrna (1997). *Buddhism in Its Relationship with Hinduism*. Kolkata: Mahabodhi Book Agency.

Dharmapala, Angarika Hewavitrna (2010). *The World Debt to Buddha*. Kolkata: Mahabodhi Book Agency.

Dutta, Ramesh Chandra (2004). *Civilisation in The Buddhist Age B. C. 320 to A.D 500*. Dellhi: Low Price Publication.

Gandhi, M. K. (1959). *The Moral Basis of Vegetarianism*. Ahmedabad: Jitendra T. Desai. Ahmedabad: Navajivan Mudranalaya 380 014 (India)।

Gupte, R. S. (1972). *The Iconography of The Hindus Buddhist and Jains*. Bombay: D. B Taraporavala Sons and Co Private Limited.

Haldar, Aruna (2001). *Some Psychological Aspects Early Buddhist Philosophy Based on Abhidharmakosha of Vasubandhu*. Kolkata: Asiatic Society.

Hazra, Kanailal (2002). *Buddhism and Buddhist Literature in Early India Epigraphy*. New Delhi: National mission for Manuscripts and Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

Jain, Br. Dr. Sneh Rani and Sethi, Nirmal Kumar Jain (first edition) 2019. *Ethiopia in Jain Perspective*. New Delhi: All India Digambar Jain Heritage Preservation Organization International Centre for Nigantha Tradition.

Joshi, Ratanlal (edited) (2000). *Uttaradhyayana-sutra*. Solana: Shri Shri Sadhu Marg Jaina Sanskriti Rakshak Sanggha.

Lama, Dalai and C. Cutler, Howard (1999). *The Art of Happiness A Handbook for Living*. London: Coronet Books Hodder and Stoughton.

Law, Churan Bimala (2012). *On the Chronicles of Ceylon.* Kolkata: Asiatic Society.

Mitra, Sisir Kumar (1979) (edited). *East Indian Bronzes*. Kolkata: Centre of Advanced Study in Ancient Indian History and Culture Calcutta University.

Morris, Charles (1889). *Aryan Sun-Myths the Origin of Religions*. TROY, N.Y.: NIMS AND KNIGHT.

Mullar, F. Max (2013) (transleted and edited). *The Secred Books of The East. Vol. 11. Buddhist Suttas.* New Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Pvt. Limited.

Munshi, K. M, Majumdar, R. C (edited) (1960). *The Age of Imperial Unity*. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.

Nagar, Shantilal (edited) (1927). *Iconography of Jaina Deities*. Vol. 1. Delhi: B.R Publishing Corporation.

R. Bates Thomas (2010). *Gramsci and the Theory of Hegemony.* University of Pennsylvania Press.

Rahaman, Mukhlesur (1998). *Sculpture in the Varendra Research Museum a Descriptive Catalogue.* Rajshahi: Varendra Research Museum.

Ray, Haraprasad (2012). *India-China Interface and the Road Ahead.* Kolkata: Asiatic Society.

Saha, Bipin R. and Barnes, Jenifar (2013). *Non-Vedic Tradition of India–Mahavira, Buddha and Gosala. Comparisons and contrasts of Buddhism and Jainism.* Dellhi: Cossmo Publication.

Sarkar, H. and Mishra, B.N. (2006). *Nagarjuna Konda.* New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sarkar, H. and Nainar S.P. (2007). *Amaravati.* Fifth Edition. New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sastri, Haraprasad (1897). *Discovery of Living Buddhism in Bengal.* Calcutta: R. Dutta Hare Press.

Shakya, Miroj (2015)। *Jainism and Buddisim: A Comparative Survey of Their Ethics.* California: Department of Buddhist Chaplaincy University of The West Los Angeles

shamashastry, R (translated and edited) (1951). *Kautilya's Arthashastra.* New Delhi: Mysore Press.

Sivaramamurti, C. (2004). *The Chola Temples.* Sixth Edition. New Delhi: Archaeological Survey of India.

Sosnoski, Daniel (edited) (1996). *Introduction to Japanese Culture.* Vermont and Tokyo, Japan: Charles E. Tuttle Company

Stevenson, Sinclair and Taylor, G. P (1915) The Religious Quest of India. *The Heart of Jainism.* London: Oxford University Press.

Swami, Vivekananda (2007). *Buddhism The Fulfillment of Hinduism Adderess at The Parliament of Religion. The Complete Works of Swami Vivekananda.* Kolkata: Advaita Ashrama.

Thomas, Edward j. (2004). *The History of Buddhist Thought.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Limited.

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

বাংলা পত্র-পত্রিকা

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) (১৯৯৯)। *অনুষ্টুপ*। সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ : গ্রীষ্ম, বর্ষা যুগ্মসংখ্যা। কলকাতা: সি. আই. টি. রোড।

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) মুখোপাধ্যায়, বন্দনা (রচিত) (১৪২২)। *বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা*। প্রাক্ শারদীয়, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

কিস্ কু, উপেন (সম্পাদিত) ও সম্পাদকমণ্ডলী (১৪০৫)। *লোকশ্রুতি*। চতুর্দশ সংখ্যা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (২০০৫)। *পরিকথা*। অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস।

চতুর্বেদী, হরিহর প্রসাদ (সংস্থাপক এবং প্রধান সম্পাদক) (২০১৬, সেপ্টেম্বর)। *পারসমালা*। বারাণসী: বিশ্বগাঁও অন্তরধর্মীয় মাসিক সংবাদ।

দত্ত, বিজিতকুমার (সম্পাদিত) (২০০০)। *আকাদেমি পত্রিকা*। দ্বাদশ সংখ্যা। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

দাস, প্রভাতকুমার (সম্পাদিত) (১৪১১)। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

পাণ্ডে, শ্রীপ্রকাশ (সম্পাদিত) (২০২০)। *শ্রমণ*। জানুয়ারি থেকে জুন সংখ্যা। বারানসী: পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ।

বসু, সঞ্জীবকুমার (সম্পাদিত) (১৪০৯)। *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা। কলকাতা: দে বুক স্টোর্স।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত) (১৪০৩)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। নবপর্যায়-৬, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

রায়চৌধুরী, সুব্রত (সম্পাদিত) (২০১৫)। *নবনির্মাণে চর্যাপদ*। কলকাতা: গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা তথ্যসূত্র দ্বিতীয় সংখ্যা।

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত) (১৪২৫)। *নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

সেন, সুনীল কুমার ও চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১২)। *প্রাচীন যুগের কথা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

ইংরেজি পত্র-পত্রিকা

Akira. Saito (editor) (2015). *Acta Asiatica.* Bulletin of The Institute of Eastern Culture. Number – 108. Tokyo: The Institute of Eastern Culture.

Anchordoguy, Marie (editor) and associate editors (2007). *The Journal of Japanese Studies.* Volume – 33, Number – 2, Summer. Thomson Hall: University of Washington.

Anchordoguy, Marie (editor) and associate editors (2011). *The Journal of Japanese Studies.* Volume – 37, Number – 1, Winter. Thomson Hall: University of Washington.

Dorman, Benjamin and Korom, Frank J. (editors) and Associate editors (2015). *Asian Ethnology.* Volume – 74, Number – 1. Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture.

Tsuyshi, Kojima (editor) (2017). *Acta Asiatica.* Bulletin of The Institute of Eastern Culture. Number – 112. Tokyo: The Institute of Eastern Culture.

Wasserstrom, Jeffrey N. (editor) and associate editors (2015). *The Journal of Asian Studies.* Volume – 74, Number – 3, August. U.K: Cambridge University Press.